ঃ এই সংখ্যায় ঃ
১) গণ কু-অভ্যাস
২) ওজনস্তর, ৩) ট্রান্স ফ্যাট
৪) বন দপ্তরের উদাসীনতা।
৫) বিকল্প সমীকরণ।
৬) বিকল্প শক্তির খোঁজ

বিজ্ঞান অন্বেষক

গ্রাহক মূল্য
বার্ষিক ১৫ টাকা, যোগাযোগ ঃ বিজ্ঞান অন্বেষক, প্রযত্নে : বিজ্ঞান দরবার, ৫৮৫ অজয় ব্যানার্জী রোড, (বিনোদনগর) পোঃ কাঁচরাপাড়া-৭৪৩১৪৫ জেলা ঃ উত্তর ২৪ পরগণা।

বর্ষ-৮ সংখ্যা - ৫ সেপ্টেম্বর-অক্টোবর/২০১১ RNI No. WBBEN/03/11192 মূল্য : ২

আন্তর্জাতিক বনপালনবিদ্যা বর্ষ - ২০১১

ভারতে বন সংরক্ষণ : অতীত ও বর্তমান

আদিম যুগ থেকেই বন্য প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের আত্মিক সম্পর্ক, অরণ্যচারী মানুষের সঙ্গে অরণ্যচারী জীবজন্তুর সহাবস্থান ছিল অরণ্যের আশ্রয়েই। বৃক্ষ-শাখাই ছিল তার আদিম আশ্রয়। আদিম মানুষ প্রথম লজ্জা নিবারন করেছিল গাছের ছালে। খাদ্য ছিল গাছের ফল। লতা-পাতা বা বৃক্ষের ছাল, শেকড় বা পাতার রস ছিল তার রোগ প্রতিষেধক। আবার বৃক্ষ শাখাই ছিল আত্মরক্ষার হাতিয়ার। এ জন্য অরণ্য প্রকৃতির প্রতি আদিম মানুষ থেকে শুরু করে প্রাচীন সভ্যতার অধিবাসীদের প্রেম, শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা ছিল অপরিসীম। সিন্ধু সভ্যতার বিভিন্ন নিদর্শনে হাতি, যাঁড়, হরিণ প্রভৃতি জীব-জন্তুর প্রতিকৃতি সে যুগে মানুষের অরণ্য-প্রীতিকেই নির্দেশ করে। বৃক্ষ পুজো, দেবদেবীর বাহন হিসেবে জীবজন্তুর মুখে ভাষা দান প্রমাণ করে বন ও বন্য প্রাণীকে ভারতীয়রা অতীত থেকেই মানুষের সমমর্যাদায় প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন।

ইতিহাসের পাতা থেকে

বন রক্ষণাবেক্ষণ ও বৃক্ষরোপনের বিষয়ে ভারতের বিভিন্ন শাসকের উদ্যোগ প্রাচীনকাল থেকেই লক্ষ্য করা গেছে। ৩০০ খ্রিষ্ট পূর্বাব্দে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য সম্ভবতঃ সর্বপ্রথম অরণ্যের গুরুত্ব উপলব্ধি করে অরণ্য রক্ষণাবেক্ষনের জন্য উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারী নিয়োগ করেন। মহামতি অশোকও বৃক্ষরোপনের ব্যাপক উদ্যোগ নিয়েছিলেন। তিনিই

এরপর 2 পাতায়

বিস্মৃত প্রায় বাঙালি বিজ্ঞানী মানিকলাল দে

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯১৫ সালের এম.এস.সি-র ব্যাচ। সত্যেন্দ্রনাথ বসু, মেঘনাদ সাহা, জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখার্জী প্রমুখ জ্যোতিষ্করা পাশ করেছিলেন ১৯১৫তে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আকাশে একসঙ্গে এত সংখ্যায় নক্ষত্রের সমাবেশ আর দেখা যায়নি। এইজন্য এই বছরটি 'ইয়ার অব গ্যালাক্সি' বলা হয়ে থাকে। এঁদের মধ্যে অনেকেই বিজ্ঞান জগতে কেন, সাধারণের কাছেও সুপরিচিত। যেমন সত্যেন, মেঘনাদ, জ্ঞান ঘোষ, জ্ঞান মুখার্জী প্রমুখ। তবে এঁদের সতীর্থ অনেকের নাম কিন্তু বিস্মৃতির অতলে রয়ে গেছে। অথচ মেধা ও গুণাবলীর দিক থেকে এঁরাও কম নন। তেমনি একটি নাম মানিকলাল দে (১৮৯৩-১৯৫০। ভাবতে কেমন লাগে যে

এরপর 4 পাতায়

রঙিন মাছের সেবা কেন্দ্র

ছোটবেলায় মাছ, পায়রা, বিড়াল, কুকুর, সাদা ইঁদুর, পাখি পোষেনি এমন শিশু গ্রামবাংলায় বিরল। আমার ছোটোবেলায় দুটো সাদা ইঁদুরছানা ছিল, একটার নাম টুকটুকি, একটা ফুরফুরি। ওরা ছাড়াই থাকত। আমরা যা খেতাম ওদেরও তাই দিতাম। এমনকি চিটেগুড় পর্যন্ত। কিন্তু বেশ কিছুদিন যাওয়ার পর ওদের অসুখ হল। কি করি? ওদের জন্য তো কোন হাসপাতাল নেই। অনেক চেষ্টা করেও বাঁচানো গেল না তাই বিদায় দিতে হল চোখের জলে। তখন থেকেই খোঁজখবর করতে করতে পেয়ে গেলাম রঙিন মাছের এক হাসপাতালের খবর। তুমি যদি জয়েন্ট এন্ট্রান্সে চান্স না পাও তাও পরোয়া নেই। কেননা তোমার মাছের ডাক্তার হতে বারণ নেই। হুগলি জেলার চন্দননগরে সাকিপাড়ার পতিতপাবন হালদার হলেন রঙিন মাছের ডাক্তারবাবু। ওঁর বাড়ির সামনে লেখা আছে 'Fish Hospital' কী দারুন না! যাদের কষ্ট প্রকাশের কোনো ভাষা নেই তাদের কষ্ট লাঘব করতে একজন মানুষ 'পতিতপাবনবাবু'।

এরপর 7 পাতায়

বন সংরক্ষণ

1 পাতার পর

প্রথম ভারতীয় শাসক হিসেবে বন ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইন চালু করেন। গুপ্তযুগ পর্যন্ত এই অরণ্য রক্ষণাবেক্ষণ ও বৃক্ষরোপনের ধারা বজায় ছিল।

এরপর পশ্চিম এশিয়া থেকে বারংবার মুসলিম আক্রমণের সময় বহু মানুষ প্রাণভয়ে পালিয়ে গিয়ে জঙ্গলে আশ্রয় নেয়। এইসব মানুষ স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য জঙ্গলের বিস্তৃর্ণ এলাকা সাফ করতে থাকে। এভাবে শুরু হয় অরণ্যচ্ছেদন পর্ব।

ভারতবর্ষ মুসলিম শাসকদের দখলে আসার পর তাঁরাও অরণ্য সংরক্ষণের উদ্যোগী হন। অধিকাংশ মুসলিম শাসক ছিলেন দক্ষ শিকারী। তাঁদের শিকার অভিযানের জন্য নির্দিষ্ট অরণ্য সংরক্ষণ করা হল, ওই সব অরণ্যে গাছ কাটা বা সাধারণ মানুষের প্রবেশ ছিল নিষিদ্ধ। এর ফলে বন্য বন্যপ্রাণী যেমন সংরক্ষিত হত, বাস্তুতন্ত্রও বজায় থাকত। মোগল সম্রাট বাবর ও জাহাঙ্গিরের জীবনী থেকেও জানা যায় যে বন্যপ্রাণীর প্রতি তাঁদের গভীর উৎসাহ ও ভালবাসা ছিল

ব্রিটিশরাজ কায়েম হওয়ার পর প্রথম দিকে কাঠের প্রয়োজনে অরণ্যের বড়ো বড়ো গাছ কাটা হত। পরবর্তীকালে কাগজ তৈরির প্রয়োজনে সাফ করা হতে থাকে একের পর এক অরণ্য। ইংল্যান্ড সহ অন্যান্য দেশে রফতানি করা হতে থাকে শাল, সেগুন ও চন্দন কাঠ। এক সময় ভারতের সমস্ত অরণ্যের একচ্ছত্র মালিক হয়ে ওঠে ব্রিটিশ সরকার। ব্রিটিশ শাসক অরণ্যকে রাজস্ব সংগ্রহের উৎস হিসেবে ব্যবহার করতে থাকে। ফলে সরকারি অনুমতি ছাড়া অরণ্যে গাছ কাটায় জারি হয় নিষেধাজ্ঞা। লাগু হয় বৃক্ষচ্ছেদন নিয়ন্ত্রন ও সংরক্ষণ আইন। এই বিষয়ে দেখভাল করা জন্য সরকারি আধিকারিক নিয়োগ করা হয়। যেহেতু ব্রিটিশ শাসকরা ভারত থেকে সেগুন কাঠ কেটে নিয়ে রফতানি করত, তাই সেগুন কাঠের জঙ্গল দেখাশোনা করার জন্য পৃথকভাবে কমিশনার নিযুক্ত হয়। ১৮০৬ সালে জাহাজ তৈরির উপযোগী গাছ ও সেগুন গাছের লভ্যতা ও সংরক্ষণ বিষয়ে দেখাশোনা করার জন্য মাদ্রাজ সরকার ক্যাপ্টেন ওয়াটসন নামে একজনকে কমিশনার হিসেবে নিয়োগ করে।

তবে গোটা দেশে বন সংরক্ষণ আইন চালু করেন লর্ড ডালহৌসি ১৮৫৫ সালে। চালু করেন নিবিড় বৃক্ষরোপন কর্মসূচী। মালাবার উপকূলের পার্বত্য অঞ্চলে সেগুন গাছ এবং নীলগিরি পার্বত্য অঞ্চলে অ্যাকাশিয়া (Acacia) ও ইউক্যালিপ্টাস গাছ লাগানো শুরু হয়।

১৮৬৫ থেকে ১৮৯৪ সাল পর্যন্ত ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতে বন সংরক্ষনের মূল উদ্দেশ্য ছিল শাসকদের প্রয়োজনীয় বিভিন্ন বনজ সম্পদের চাহিদা পূরণ। এই উদ্দেশ্যে গাছ কাটার সাথে সাথে বন সৃষ্টির জন্য গাছ লাগানোও হতে থাকে। ১৯২৬ সাল থেকে ব্রিটিশরা ভারত ছেড়ে চলে যাওয়ার আগে পর্যন্ত পাঞ্জাব ও উত্তরপ্রদেশে গাছ লাগিয়ে বন সৃষ্টি করা হয় বিরাট আকারে। তিরিশের দশক থেকে ভারতীয়রা বন্যপ্রাণী সংরক্ষনের ব্যাপারে আগ্রহী হল। পরাধীন ভারতবর্ষে মূলতঃ কিছু করদ রাজা নিজেদের শিকারের প্রয়োজনে কোথাও কোথাও পাখি ও স্তন্যপায়ী প্রাণী সংরক্ষন শুরু করেন। এই প্রচেষ্টায় কয়েকটি প্রজাতির বিলুপ্তি যেমন রোধ হয়, তেমনই অভয়ারন্য ও জাতীয় উদ্যান তৈরির একটা সূত্রপাত হয়।

স্বাধীনোত্তর ভারতে সংরক্ষণ

ভারত স্বাধীন হওয়ার পর জওহরলাল নেহেরুর নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার বননীতির তেমন কোনও রদবদল ঘটায়নি। ফলে ব্রিটিশ সরকারের তৈরি বননীতিই প্রায় অপরিবর্তিতভাবে অনুসৃত হয়। যেটুকু পরিবর্তন করা হয় তাহল, ভারতের মূল ভূখন্ডের এক তৃতীয়াংশে অরণ্য সংরক্ষনের নীতি গৃহীত হয়। সেই সঙ্গে স্থির হয় যে অরণ্যের ক্রমবিলুপ্তি রোধ করতে কিছু কাজকর্ম নিষিদ্ধ করা হবে এবং পশুচারণ নিয়ন্ত্রণ করা হবে, যদিও পরবর্তী ২০ বছরে তেমন কোনও সদর্থক পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি।

প্রয়াত ইন্দিরা গান্ধীর প্রধানমন্ত্রীত্বের সময়ে ১৯৭২ সালে সংসদে বন্য প্রাণী সংরক্ষন আইন পাস হয়। এরপর ১৯৮০ সালে লাগু হয় বন সংরক্ষন আইন,এই আইন ছিল মূলত ব্রিটিশদের তৈরি করা বন আইন ১৮৭৮ ও ১৯২৭-এর বর্ধিত রূপ। এই আইনের বলে ভারতের বিভিন্ন বনাঞ্চলের কোনওটা সংরক্ষিত বন, কোনওটা অভয়ারন্য, কোনওটা জাতীয় উদ্যানের স্বীকৃতি পেল। কিন্তু এর পাশাপাশি বিপদ ঘনাল অরণ্যবাসী উপজাতি সম্প্রদায়ের। ওঁরা পুরুষানুক্রমে অরণ্য সম্পদের উপর নির্ভর করে জীবিকা নির্বাহ করেছেন। নতুন আইনে আক্রান্ত হল তাদের বাসস্থান ও জীবিকা।

সে যাই হোক, বন ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইন হওয়ার পর মানুষের মধ্যে এই বিষয়ে সচেতনতার মাত্রা গত ৩০ বছরে কিছুটা হলেও বেড়েছে। ১৯৭০ এর দশক পর্যন্ত বনকে অর্থ উপার্জনের উৎস বলেই মনে করা হত। ফলে বনের পরিচর্যা কিংবা সংরক্ষন নিয়ে কারও তেমন মাথাব্যথা ছিল না। অথচ ভারতবর্ষ হল বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ জীববৈচিত্রময় দেশ, ইউনেস্কো তাদের Man and Bio-sphere (MAB) প্রোগ্রাম চালু করার (১৯৭১) কয়েক বছর পরেই, ১৯৭৯ সালে ভারতে নীলগিরি বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ স্থাপন করা হয়, গোটা পৃথিবীর ৯৫টি দেশের ৪২৫টি বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভের মধ্যে বর্তমানে ভারতেই রয়েছে ১৩টি, এগুলি হল—লালগিরি, নন্দীদেবী, নকরেক (মেঘালয়), গ্রেট নিকোবর দ্বীপ, মান্নার উপসাগর, মানস, সুন্দরবন, সিমলিপাল, ডিব্রু-সাইখোয়া, দেহাং-দেবাং (অরুনাচল), পাঁচমারি, কাঞ্চনজঙ্ঘা ও অগস্থ্যমালাই। এদের মধ্যে আয়তনের হিসেবে সবচেয়ে বড়ো মান্নার উপসাগর (১৫,৫০০ বর্গ কিমি) এবং সবচেয়ে ছোটো নকরেক (৮০ বর্গ কিমি)। ভারতে এই মূহুর্তে জাতীয় উদ্যানের সংখ্যা ৯২ এবং অভয়ারন্যের সংখ্যা ৪৯২। ভারতের মোট আয়তনের ১.১৭ শতাংশ দখল করে রয়েছে ওই জাতীয় উদ্যানগুলি। অভয়ারন্যগুলির মোট আয়তন ভারতের ৩.৫৬ শতাংশ। সবচেয়ে বেশি জাতীয় উদ্যান রয়েছে মধ্যপ্রদেশ এবং আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে, ৯টি করে। আর একমাত্র পাঞ্জাবের কোনও জাতীয় উদ্যান নেই। আবার আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে

এরপর 3 পাতায়

বন সংরক্ষন

2 পাতার পর

রয়েছে সর্বাধিক ৯৬টি অভয়ারন্য। পশ্চিমবঙ্গে বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ একটি—সুন্দরবন। আর জাতীয় উদ্যান ও অভয়ারন্যের সংখ্যা যথাক্রমে ৫ ও ১৫।

সারা পৃথিবীতে যত প্রজাতির উদ্ভিদ ও প্রাণী আছে তাদের ১৪ শতাংশের বেশি প্রজাতির বাসভূমি হল ভারতবর্ষ। তাই জীববৈচিত্রময় অঞ্চলের নিরিখে ভারত হল 'হট্স্পট'। গত ৩০ বছরে বেশ কিছু প্রজাতির সংখ্যা এই সংরক্ষন আইনের কারণে যেমন বৃদ্ধি পেয়েছে (যেমন গন্ডার, হাতি, চিঙ্কারা, নীলগাই, কস্তুরি মৃগ, বারশিঙা, গাউর, তুষার চিতা ইত্যাদি) তেমনই কিছু প্রজাতি পুনরাবিষ্কৃত হয়েছে (যেমন অরুনাচল প্রদেশে Leaf deer, পশ্চিমঘাট পর্বতমালায় hook nose frog ইত্যাদি), তবে এই সংরক্ষন নীতির ফাঁকফোকরগুলো চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে রাজস্থানের সারিস্কা ব্যাঘ্র প্রকল্প। ২০০৫ সালের মধ্যে চোরাশিকারীরা কীভাবে যে সারিস্কা-কে বাঘশূন্য করে দিয়েছে কেউ টেরই পায়নি।

তপশিলী উপজাতি ও বনবাসী বিল (২০০৬) এবং কিছু কথা...

২০০৬ সালে সংসদে পাস হয়েছে তপশিলী উপজাতি ও বনবাসী (বন অধিকার প্রত্যভিজ্ঞা) বিল। আর এই বিল ঘিরে তৈরি হয়েছে নানা প্রশ্নচিহ্ন। বন সংরক্ষণ আইনে বহুদিন ধরে অরন্য সম্পদের উপর নির্ভরশীল তপশিলী উপজাতি ও বনবাসী মানুষের জীবন-জীবিকা বিপন্ন হয়ে পড়েছিল। কেন্দ্রের উপজাতি বিষয়ক মন্ত্রকের পরিকল্পনায় তৈরি হয় এই বিল। এই আইনের বলে বনবাসী ও উপজাতি মানুষজনে বাসস্থান হিসেবে ওই মন্ত্রক অরণ্যকে অধিগ্রহণ করতে পারবে, এই আইনের ফলে ভারতের অরণ্য এলাকার ১৫ শতাংশ, অর্থাৎ ভারতের ভূমিভাগের ৩ শতাংশ এলাকা (৫ লক্ষ বর্গ কিমি) কেন্দ্রীয় বন ও পরিবেশমন্ত্রকের আওতা থেকে কেন্দ্রীয় উপজাতি বিষয়ক মন্ত্রকের নিয়ন্ত্রণে চলে এসেছে।

শোরগোল তুলেছেন পরিবেশবিদদের একাংশ। গত ৩০ বছরে বন সংরক্ষণ নীতির ফল আশানুরূপ মেলেনি। বহু সংরক্ষিত বন এলাকাতে এমনিতেই বন বিভাগের নিয়ন্ত্রণ নেই, যেমন ইন্দ্রাবতী, পালামেট, জাইমুর, বাল্মীকিনগর, হস্তিনাপুর, ওরাং ও চন্দ্রপ্রভা সংরক্ষিত অরণ্য। তার ওপর এই বিল কার্যকরী হওয়ায় উপজাতি বিষয়ক মন্ত্রক উপজাতিদের উন্নতিকল্পে নানা কর্মসূচী নেওয়া শুরু করেছে। ভবিষ্যতে আরও করবে, বিলে বলা আছে উপজাতি বিষয়ক মন্ত্রক সরকারি সংস্থাকে দিয়ে ওই এলাকায় বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্প গ্রহণ করবে, যেমন স্কুল, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, বিদ্যুতের সাব স্টেশন, পানীয় জল প্রকল্প, সেচখাল খনন, পুলিশ ফাঁড়ি তৈরি ইত্যাদি। এইসব উন্নয়ন প্রকল্প চালু হলে সবই ভালো হবে, কেবল ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা বনের পরিবেশ।

ওই বিলে বলা হয়েছে, প্রকল্প চালু করার ক্ষেত্রে সরকারি সংস্থা ৫০টির বেশি গাছ কাটতে পারবে না, আর গাছ কাটার পর দ্বিগুন পরিমাণ দেশীয় বৃক্ষ বিকল্প স্থানে লাগাতে হবে ও তাদের রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে, প্রশ্ন, উপজাতি বিষয়কমন্ত্রক কি এককভাবে নজরদারি করতে পারবে কোন গাছ কাটা হচ্ছে, কতগুলো কাটা হচ্ছে, কতগুলো ও কী গাছ লাগানো হচ্ছে? বিলে বলা হয়েছে যদি প্রকল্প রূপায়ন করতে গিয়ে এলাকায় কোনও উদ্ভিদ বা প্রাণীর প্রজাতি ক্ষতিগ্রস্ত বা ধ্বংস হয় তা হলে তার দায় ওই সরকারী সংস্থার উপর বর্তাবে, এখানেও প্রশ্ন, উপজাতি বিষয়ক মন্ত্রকের কাছে কি এলাকার সমস্ত প্রজাতির রেকর্ড থাকবে কিংবা ওই মন্ত্রক বিপন্ন বা বিলুপ্ত প্রজাতি চিহ্নিত করতে পারবে?

উপজাতি, আদিবাসী উন্নয়নের বিরুদ্ধে কেউই নয়। বিষয়টি এতটাই স্পর্শকাতর যে বনাঞ্চলের ভবিষ্যৎ প্রশ্নচিহ্নের মুখে দাঁড়ালেও এই বিলের সমালোচনা করতে রাজি নয় কোনও রাজনৈতিক দল। ভোট বড়ো দায়! অরণ্য সংরক্ষণ ও উপজাতি উন্নয়ন এই উভয় সংকটে পড়ে আজও কোনওটাই সাফল্যের মুখ দেখেনি। ২০১১ সালকে রাষ্ট্রপুঞ্জ আন্তর্জাতিক বনপালনবিদ্যা (International year of forestry) হিসেবে ঘোষণা করেছে। এখন দেখার এই ঘোষণা ভারতের অরণ্য ভাগ্যাকাশে কোনও আশার আলোর রেখা হাজির করতে পারে কিনা।

লেখকঃ সৌম্যকান্তি জানা, M: 9434570130
E-mail : janasoumyakanti@gmail.com

রিপোর্ট

ভূমিকম্প বিপর্যয় মোকাবিলা সচেতনা শিবির

২৯ সেপ্টেম্বর, কোচবিহার ঃ স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে ভূমিকম্পে কি কি সাবধানতা ও প্রাকৃতিক বিপর্যয় মোকাবিলা কিভাবে করতে হবে এ বিষয়ে সচেতনতা শিবির ও প্রচারাভিযান এর আয়োজন করল কোচবিহার বিজ্ঞান চেতনা ফোরাম ও বিজ্ঞান অন্বেষক। সাম্প্রতিক প্রবল মাত্রায় ভূমিকম্পে সিকিম, নেপাল, দার্জিলিং, শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি ও কোচবিহার সহ গোটা উত্তরবঙ্গে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়।

কোচবিহার বিজ্ঞানচেতনা ফোরাম ও বিজ্ঞান অন্বেষক যৌথভাবে প্রচারপত্র বিভিন্ন স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে প্রচার চালান।

২৯ সেপ্টেম্বর কোচবিহার উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে ছাত্রীদের মধ্যে ভূমিকম্প বিপর্যয় সচেতনতা শিবিরে প্রধান শিক্ষিকা মায়া অধিকারী বলেন ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে এ বিষয়ে সচেতন করার জন্য প্রচার কর্মসূচীর আয়োজন করা হয়েছে। বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা অঞ্জনা পাল বলেন ভূমিক্ষয় রোধ করতে হবে। গাছপালা ধ্বংস করে নগরায়নের নামে বহুতল বাড়ী তৈরী বন্ধ করতে হবে, গাছপালা না থাকলে ভূমিকম্পজনিত ধস-এর ফলে বাড়ী ঘর ধসে প্রচন্ড ক্ষয়ক্ষতি হয়।

আলোচনাসভায় কোচবিহার বিজ্ঞান চেতনা ফোরামের জয়দেব দে, শঙ্কর নারায়ন দাস, শেখর ঘোষ বক্তব্য রাখেন। বিভিন্ন খবরের কাগজের কাটিংস, প্রশ্নোত্তর পর্ব, ভূমিকম্প বিপর্যয়ে কি কি সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত, বাড়ি ঘর কেমন ভাবে তৈরী করতে হবে বিষয়গুলি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

—নিজস্ব প্রতিনিধি

বিস্মৃত প্রায় বাঙালি বিজ্ঞানী

1 পাতার পর

সত্যেন বসুর মেধা ছিল কিংবদন্তীতুল্য, যাঁকে তাঁর স্কুল শিক্ষক উপেন্দ্রনাথ বক্সী গণিতের খাতায় একশোর মধ্যে একশো দশ নম্বর দিয়েছিলেন সেই সত্যেন তখনকার এন্ট্রান্স পরীক্ষায় পঞ্চম স্থান অধিকার করেছিলেন (১৯০৯) এবং তাঁর সঙ্গে একই নম্বর পেয়ে যিনি পঞ্চম স্থানের অংশীদার হয়েছিলেন তাঁর নাম মানিকলাল দে। সত্যেন যেমন ছিলেন হিন্দু স্কুলের ছাত্র, মানিক ছিলেন রাস্তার বিপরীত দিকের হেয়ার স্কুলের। এরপর দুজনেই আই.এসসি-র ছাত্র হলেন প্রায় একই চত্বরের প্রেসিডেন্সি কলেজে। ১৯১১ সালে আই.এস.সি পরীক্ষার রেজাল্ট বেরোতে দেখা গেল বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম স্থান পেয়েছেন সত্যেন, আর দ্বিতীয় স্থানে মানিকলাল। এ থেকেই মানিকলাল দে-র অসামান্য মেধার আংশিক পরিচয় পাওয়া যায়।

কে এই মানিকলাল? এ ব্যাপারে এ দেশে আধুনিক রসায়নের জনক আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের স্মরণ নেওয়া যাক। 'আত্মচরিত' এ প্রফুল্লচন্দ্র লিখেছেনঃ '১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে বাংলার রাসায়নিক গবেষণার ইতিহাসে একটি নতুন অধ্যায় আরম্ভ হইল। ওই বৎসর কয়েকজন মেধাবী ছাত্র প্রেসিডেন্সী কলেজে প্রবেশ করেন। তাঁহারা সকলেই পরে বৈজ্ঞানিক গবেষণার ক্ষেত্রে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। জ্ঞানেন্দ্র চন্দ্র ঘোষ, জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, মানিকলাল দে, সত্যেন্দ্রনাথ বসু এবং পুলিনবিহারী সরকার আই.এসসি ক্লাসে ভর্তি হন, রসিকলাল দত্ত এবং নীলরতন ধর বি.এস.সি উপাধির জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন। মেঘনাদ সাহাও ঢাকা কলেজ হইতে আই.এসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া এই সময়ে ঘোষ, মুখোপাধ্যায় প্রমুখের সঙ্গে বি.এসসি ক্লাসে যোগদান করেন। রসিকলাল দত্ত, মানিকলাল দে এবং সত্যেন্দ্রনাথ বসু কলকাতাতেই পৈতৃক গৃহে লালিত পালিত। ঘোষ, মুখোপাধ্যায়, সরকার, সাহা এবং ধর মফস্সল হইতে আসিয়াছিলেন এবং প্রেসিডেন্সী কলেজের সংলগ্ন ইডেন হোস্টেলে থাকিতেন।'

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের এই বিবরণ থেকে মানিকলাল দে যে একজন মেধাবী ছাত্র একথা স্পষ্ট। এছাড়া মানিকলাল ও সত্যেন দুজনেই কলকাতার ছেলে এরও ইঙ্গিত মেলে। আসলে সত্যেনের বাড়ি উত্তর কলকাতার গোয়াবাগান আর মানিকলাল থাকতেন বিডন স্ট্রিট। হিন্দু হোস্টেলে যাঁরা ছিলেন তাঁদের মধ্যে প্রগাঢ় বন্ধুত্বের কথা প্রফুল্লচন্দ্রের লেখায় পাওয়া যায়। কিন্তু মানিকলাল ও সত্যেনের ঘনিষ্ঠতার বিষয় পারিবারিক সূত্র ও অন্যান্য বিবরণ থেকে তল্লাসি করে জানতে হয়। প্রসঙ্গত মানিকলাল দে সম্পর্কে তেমন কোন আলোচনা হয়েছে বলে জানা নেই। গত শতকের যে পর্বে বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ, মেঘনাদ, জ্ঞান ঘোষ প্রমুখদের জন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপিত হল, সে সময়ই মানিকলাল সম্পর্কে তথ্য পরিবেশিত হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তা ঘটেনি। অথচ, সুখে দুঃখে মানিকলাল সত্যেন বসুর কতটা কাছের ছিলেন, তার কিছুটা আন্দাজ করা যায়, যখন জানা যায়, মানিকলালের অকাল মৃত্যুকালে সমস্ত সময়ই প্রিয় বন্ধু তাঁর শয্যা পাশ্বে ছিলেন এবং তিনি চলে যেতে বালকের মত কেঁদেছিলেন বলে পরিবারের লোকজনদের কাছ থেকে জানা যায়।

মানিকলাল দে-র জন্ম ১২৯৯ বঙ্গাব্দে চৈত্র মাসে উত্তর কলকাতার চার নম্বর বিডন স্ট্রিট ঠিকানায়। পিতা ছিলেন রমানাথ, পেশায় চিকিৎসক। মাতা ছিলেন নিকুঞ্জমোহিনী। মানিকলালের একজন পিতামহ ছিলেন সেকালের খতি প্রসিদ্ধ ব্যক্তি রায়বাহাদুর কানাইলাল দে (১৮৩১-১৮৯৯)। কানাইলাল ছিলেন বিখ্যাত ডাক্তার, রসায়নবিদ ও বহুমুখী প্রতিভাধর ব্যক্তি। যৌথ পরিবারে জন্ম হলেও মানিক একেবারে ছেলেবেলা তাঁর পিতাকে হারান। ফলে প্রায় শৈশব থেকে বিধবা মাতা ও কনিষ্ঠদের দেখাশুনার দায়িত্ব নিতে হয় তাঁকে। একেবারে শুরুতে মানিকের পড়াশুনা আহিরীটোলা বঙ্গ বিদ্যালয়। ১৯০৪ সালে ভর্তি হন হেয়ার স্কুলে। এখানে তিনি মেধাবী ছাত্র হিসাবে বিনা বেতনে পড়বার সুযোগ পেয়েছিলেন। এই স্কুল থেকে ১৯০৯ সালে এন্ট্রান্স পরীক্ষায় পঞ্চম স্থান পান।

আই.এস.সি প্রেসিডেন্সি কলেজে তাঁর সহপাঠী সত্যেন, জ্ঞান ঘোষ, জ্ঞান মুখার্জী এঁরা। আই.এসসি পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান পেয়ে একই কলেজে বি.এসসি ক্লাসে ভর্তি হন। অনার্স ছিল কেমিস্ট্রিতে। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের স্নেহধন্যে পড়াশুনা চলতে থাকলো। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত পরীক্ষায় আগেকার ধারাটি রাখতে পারেননি। বি.এসসি ও এম.এসসি দুটি পরীক্ষায় মানিকলাল সাধারণ দ্বিতীয় শ্রেণীতে অনার্স পেয়ে উত্তীর্ণ হলেন। সম্ভবত পারিবারিক নানা সমস্যার কারণেই তাঁর পড়াশুনায় ব্যাঘাত ঘটেছিল বলে জানা যায়। এছাড়া তাঁর শরীর প্রায়ই অসুস্থ থাকত। সে যাই হোক, এম.এসসি উত্তীর্ণ হয়ে মানিক আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের অধীনে গবেষণার কাজে যুক্ত হলেন। তাঁর সঙ্গে সহযোগিতা করেছিলেন জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের 'আত্মচরিত' বইতে তিনি জানিয়েছেন 'জে সি ঘোষ, জি এন মুখুজ্যে এবং মেঘনাদ সাহা এই সময় উদীয়মান বৈজ্ঞানিক। ...ক্রমশই অধিক সংখ্যক কৃতবিদ্য ছাত্র এইদিকে আকৃষ্ট হইতে লাগিল এবং গবেষণার প্রতি তাহাদের আগ্রহ দেখা যাইতে লাগিল। ইহাদের মধ্যে মানিকলাল দে, এফ.ভি.ফার্নান্ডেজ এবং রামচন্দ্রলাল দে-র নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তবে পারিবারিক নানা সমস্যার কারণে উদীয়মান গবেষক মানিকলাল দীর্ঘদিন আচার্য্যের অধীনে থাকতে পারেননি। তাঁকে চাকরির প্রয়োজনে গবেষণা বন্ধ রাখতে হয়েছিল। তবে কিছু গবেষণা কাজ তিনি করেছিলেন। তাঁর নথিপত্র থেকে কিছু গবেষণাপত্রের হদিস মেলে। যেমন —'Mercuric Sulpho Iodide / A Case of Reversible Phototropy / By Manik Lal Dey, M.Sc. প্রকাশ পেয়েছিল 2nd Asso. for the Cultivation. of Sc./Reprinted from the Report of 1917.

কিছুদিনের মধ্যে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের সুপারিশে মানিকলালকে ভারত সরকারের অর্ডিনান্স বিভাগে চাকরি নিতে হয়। জানা যায়, প্রথমে তিনি নৈনিতাল ছিলেন। এরপর কাজের দায়িত্বে অবিভক্ত ভারতের বিভিন্ন জায়গায় তাঁকে যেতে হয়েছে। অতি পুরনো একটি কার্ডে দেখা যায় তাঁর পরিচয়পত্রঃ 'Mr. M.L. Dey/Assistant Chemical In-

এরপর 5 পাতায়

বিস্মৃত প্রায় বাঙালি

4 পাতার পর

spector/Indian Ordinance Department' পড়ের তিনি Chemical Inspector পদে উন্নীত হয়েছিলেন বলে জানা যায়। তাহলেও তাঁর গুনাবলীর প্রেক্ষিতে তাঁর যে উঁচু পদ হওয়া উচিত ছল তা নেটিভ বলে তিনি পাননি। যদিও তাঁর বিভাগের প্রধান A Marshal একটি চিঠিতে অন্য কোন সাহেবকে লিখছেন (26 March 1928) 'He is an exceptionally good-with a remarkable knowledge not only of chemistry but also of physics & allied subjects. একই ব্যক্তি Marshall সাহেব দেশে ফিরেও আন্তরিকভাবেই চেয়েছেন মানিকলাল তাঁর যোগ্য পদ পান। পুরনো একটি চিঠিতে দেখা যায় তিনি লিখছেনঃ 'I have written to Dr. Rotter who has succeeded Sir R. Robertson at the Research Department....I hope that you will get this or some other suitable appointment' (মানিকলালকে লেখা Marshall এর চিঠি। লেখা হয়েছিল ১৭-১০-১৯৩০ তাঃ। ঠিকানা ঃ Hillsleigh Road, Compden Hill, W.8.)।

তবে মানিকলালের মত যোগ্য বিজ্ঞানীর যে উপযুক্ত পদ মেলেনি, সেটি বুঝতে অসুবিধা হয় না তাঁর সতীর্থ বন্ধু-বান্ধবদের চিঠি থেকে। এছাড়া মানিকলালের পারিবারিক ও আরও নানা সূত্র থেকে বুঝা যায়। মানিকলালের স্বাস্থ্য তেমন ভাল ছিল না, আর পেশাগত দিক থেকে কিছুটা অসুস্তুষ্ঠির কারণে মানসিক দিক থেকে তিনি ভারাক্রান্ত ছিলেন। তাঁর সতীর্থরা হয়ত এসব বুঝেই তাঁর মত যোগ্যজনকে উপযুক্ত কাজে লাগাতে ব্যস্ত ছিলেন। যেমন জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ ঢাকা থেকে ৩ জুলাই ১৯৩৯ তারিখে চিঠিতে লিখছেন : 'Your friend and admirers are anxious to bring you out from the secluded life that you have chosen for yourself, And accordingly they have included you in a subcommittee for chemicals under the auspices of the Indian National Planning Committee....As Chairman of the Committee, I count very much on your help and active cooperation. ঠিক একই দিনে অর্থাৎ ৩ জুলাই ১৯৩৯ ঢাকা থেকে বন্ধু সত্যেন মানিককে চিঠিতে লিখছেনঃ এই সঙ্গে জ্ঞানের চিঠি পাবে। কেমিক্যালস এবং (শব্দটি অস্পষ্ঠ) বিষয়ে তোমার যে অভিজ্ঞতা আছে আমাদের দেশে অন্য কারোর সেরূপ আছে কিনা সন্দেহ! National Planning Committeel তে Workable কিছু Scheme খাড়া হয়; এই আমরা সকলেই চাই, তুমি যদি কিছুদিন থেকে কাজটা এগিয়ে দিতে পারো তো বড় ভাল হয়। জ্ঞানের প্ল্যান তোমাকে ব্যাঙ্গালোর নিয়ে যাওয়া। মধ্যে তোমার শরীর যেরূপ খারাপ হয়েছিল, ব্যাঙ্গালোরে গেলে আমার মনে হয় খুব উপকার হবে।... কলকাতায় বসে বসে Child Psychology চর্চা করার থেকে কিছুদিন ঘুরে আসা মন্দ কি?'

আসলে মানিকলাল কি চাইল্ড সাইকোলজি চর্চা করতেন? সত্যেনের চিঠি থেকে তাই ধরে নিতে হয়। দেশ তখন পরাধীন। পরাধীন দেশের নেতৃবৃন্দদের বুঝাতে অসুবিধা হয়নি দেশের অগ্রগতির জন্য বিজ্ঞানের উন্নতি একান্ত জরুরি। পন্ডিত নেহেরুও আরও কয়েকজন বিশিষ্ট নেতাদের কথায় ১৯৪০ সালে ব্যাঙ্গালোরে যে সভা আহ্বান করা হয়েছিল, তাতে কেমিক্যাল কমিটির সদস্য হিসাবে মানিকলাল সেখানে উপস্থিত। কিন্তু উপস্থিত হয়েও হঠাৎ অসুস্থতার কারণে তাঁর হয়ে ভাষন পাঠ করেছিলেন সহপাঠী বন্ধু বিজ্ঞানী জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ।

মানিকলাল ছিলেন অকৃতদার নিজে সংসারী না হলেও তাঁর ভরনপোষনের পরিবার ছিল বেশ বড়। ১৯৪৫ সালে তাঁর অনুজ সুবলচন্দ্রের অকাল মৃত্যুতে তিনি মানসিক ভাবে একেবারে বিপর্যস্ত হন। ইতিমধ্যে তিনি নানা রোগে আক্রান্ত হয়ে কষ্ট পেতে থাকেন মূত্র থলিতে পাথর জমে তাঁর মৃত্যুক ত্বরান্বিত করে। ১৯৫০ সালের ২৪ ডিসেম্বর তাঁর মৃত্যু হয়।

অসাধারণ মেধাবী মানিকলাল শুধু কেমিষ্ট্রি বিষয়েই নয়, জ্ঞান বিজ্ঞানের নানা ধারায় এমনকি সাহিত্য,দর্শন ইত্যাদি বিষয়ে তাঁর বিচরণ ছিল অবাধ। বিজ্ঞানী বন্ধু ছাড়া বিশিষ্ট সঙ্গীতজ্ঞ দিলীপ রায় (ডি.এল রায়ের পুত্র), বিশিষ্ট সাহিত্যিক প্রমথনাথ চৌধুরী, বুদ্ধিজীবী ও নানাশাস্ত্রবিদ ধূর্জটি প্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর সখ্যতা ছিল। এসব ছাড়া রবীন্দ্রনাথ তাঁর জোড়াসাঁকোর বাড়িতে সাহিত্য সভায় মানিককে আমন্ত্রণ জানাতে ভুলতেন না।

প্রমথনাথ চৌধুরী ও মানিকলালের চিঠিপত্র আদানপ্রদানের প্রধান কারণ ছিল সাহিত্য বাসরে মানিকলালের উপস্থিতি (সত্যেন্দ্রনাথ সহ) এছাড়া রবীন্দ্রনাথের চেষ্টায় সেসময় কেমিষ্ট্রি বিষয়ে পরিভাষা রচনা। মানিকলাল কেমিষ্ট্রির পরিভাষা করে দিয়েছিলেন। এ ব্যাপারে তাঁকে সাহায্য করেছিলেন সুরেন মৈত্র মশায়।

নমুনা হিসেবে মানিককে লেখা প্রমথনাথ চৌধুরীর একটি চিঠির সামান্য অংশ খুলে দেওয়া হলঃ

'সবিনয় নিবেদন — 1, Bright St. / Ballygunge
26/6/17 ; মঙ্গলবার

বাংলা ভাষায় সেই Series যে বার করবার সংকল্প আমরা আজও ত্যাগ করিনি বরং রবিবাবু মহশয়ের আগ্রহে ও যত্নে সে সংকল্প কার্য্যে পরিণত হবার উপক্রম হয়েছে। এই বিষয়ে পরামর্শ করবার জন্য আমরা কাল সন্ধ্যে সাড়ে ছটার সময় রবিবাবু মহাশয়ের ওখানে সমবেত হব। রবিবাবু মহাশয় বিশেষ করে আপনার নাম উল্লেখ করে বলেছেন যে তাঁর নিতান্ত ইচ্ছা যে আপনি কাল উপস্থিত থাকেন। স্থরিতের মুখে শুনলুম আপনি কেমিষ্ট্রির একটা খসড়াও করে রেখেছেন....।

ইতি শ্রী প্রমথনাথ চৌধুরী

(পাক্ষিক বসুমতী, ১৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৩ থেকে)

এরপর 9 পাতায়

গন কু-অভ্যাস ও সামাজিক পরিবেশ

বাঙালি আত্মঘাতী; বাঙালি আত্মবিস্মৃত জাতি; বাঙালি জাতি আজ অধঃপতিত। ছিদ্রান্বেষী, পরচর্চাবিলাসী, স্বার্থপরতায় মগ্ন এমন অভিযোগের তির প্রায়শই ধেয়ে আসে বাঙালির ওঠাবসার চারপাশের চৌহদ্দির মধ্যে থেকে।

কিন্তু সংস্কৃতিচর্চায় বা সংস্কৃতিমনস্ক রুচিশীল বলে বাঙালির একটা সর্বভারতীয় পরিচিতি আছে বলেই আমাদের অনেকের মনে হয়। বিগত এক/দু'দশকে এই গৌরবময় ঐতিহ্য শুধু কালিমালিপ্ত নয়; অনাচারের তান্ডব আস্ফালনে কিষ্কিন্ধাবাসী লেজওয়ালী প্রাণীরাও লজ্জা পাবে।

ট্রেনে সিগারেট খাওয়া আইনত নিষিদ্ধ। যেসব ডেলি-পাষন্ড দল বেঁধে যাতায়াত করেন, তাঁদের কাছে এই আইন মান্যকরা নিজেদের পৌরুষের (পড়ুন বীরত্বের) পক্ষে অবমাননার। খৈনির ডিব্বা এখন ১৪ থেকে ৮০ বছর বয়সী অধিকাংশ পুরুষের প্রায় আবশ্যিক অপরিহার্য সঙ্গী বিশেষ। চুনযোগে খৈনি ডলা; তারপর ঝাড়া। পাশের শিশু-মহিলা বা অন্যযাত্রীর এতে কাশি হলে কী করা যাবে! সর্বত্র খৈনি গেলা পরে থুতু ফেলা (একবার খৈনি গালে দিলে, কমবেশি বার দশেক থুতু ফেলতে হয়) এখন একটা আকছার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। স্টেশনে ট্রেন দাঁড়িয়ে আছে। আপনি পাশ দিয়ে হাঁটছেন। অবধারিত আপনার গায়ে/জামা-প্যান্টে খৈনির পিক আছড়ে পড়বে। কিন্তু প্রতিবাদ হলে, বড়ো জোর 'সরি' এই কথাটুকু প্রত্যুত্তরে পাওয়া যেতে পরে। যদি একধাপ এগিয়ে আপনি একটু জোরে প্রতিবাদ করেন এসব অসভ্য-অভ্যাসের বিরুদ্ধে তাহলে প্রথম যে উত্তরটা পাওয়া যায়, 'আপনি আমাকেই খালি বলছেন। সবাই তো এ রকমই করে। আমারবেলায় দোষ হয়ে গেল' এটাই প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া।

আজকাল আমি ট্রেন, বাস, ট্যাক্সি এমনকি সাইকেল আরোহীদের বিষয়ে খুব সতর্ক থেকে চলাফেরা করি। সেদিন মোটর সাইকেল চালানো এক তরুন-যুবা সরাসরি জামায় ও হাতে পিক ছুঁড়ে দিয়ে নায়কোচিত বীরত্বে উধাও হয়ে গেলেন। প্রতিবাদ তো দূর অস্ত! 'সরি' এটুকু শিষ্টাচারও অনুপস্থিত। পানপরাগ, পানমশলা ইত্যাদির দৌরাত্ম্যে রাস্তাঘাট হাটবাজার হাসপাতাল সরকারি অফিস আদালত স্কুল কলেজের স্টাফরুম, পাড়ার ক্লাব চত্বর নরকের অধম বললেও কম বলা হয়। লজ্জাঘেন্নার মাথা খেয়ে শিক্ষক/আইনজীবী/দোকানদার ব্যবসায়ী সমাজ/সরকারি কর্মচারী ছাত্র সমাজের একটা বড় অংশ, কৃষক ও শ্রমিক (শ্রমজীবী মানুষের প্রায় ৯০ শতাংশ) এঁরা সবাই প্রকাশ্যে নেশা খোর। এর জন্য লাজলজ্জার কোনও প্রসঙ্গ থাকতে পারে এমন বোধটুকু উধাও। আমরা (পড়ুন বাঙালিরা) মাড়োয়ারি সম্প্রদায়ের মানুষকে অবজ্ঞা করে বলে থাকি মেড়ো; হিন্দুস্থানিদের বলি 'খোট্টা' (যেহেতু এঁরা খৈনিখেকো), ওড়িষ্যার লোকেদের উড়ে; শিখ-পাঞ্জাবিদের 'বাঁধাকপি' (মাথায় পাগরি থাকে বলে) ইত্যাদি। কিন্তু আজকের বাঙালি সভ্যতায়, শিষ্টাচারে, সুভদ্র-নাগরিকত্বের নিরিখে কোন তাকানিতে এসে পৌছেছেন, তার কোন হুঁশ আমাদের আছে? আমার উত্তর নেই। থাকলে চারপাশের দোকানগুলিতে পানপরাগ/পানমশালা....ইত্যাদির রঙিন প্যাকেট (১ টাকা মূল্যের) এমন সুসজ্জিত চেহারায় শোভা পেত না। পান খাওয়া বাঙালির চিরকালীন ন্যায্য বিলাসিতার অঙ্গবিশেষ। পানের দোকানে রাস্তার মোড়ে মোড়ে চাকুরী বা আয়ের উপযুক্ত কাজ না পেলে লোকেদের চা-পান-বিড়ি সিগারেটের দোকান দেওয়াটাই সর্বপ্রথম মাথায় আসে। নিজের বাড়িটুকু ছাড়া আর যেখানে খুশি পরিষ্কার দেওয়ালে পানের পিক-থুতু ফেলতে আমরা বড়ো ভালোবাসি। যিনি নিজের বাড়িকে সাজিয়ে গুছিয়ে টিপ-টাপ রাখেন, তিনি কিন্তু অফিসে ওঠার সিঁড়িতে অবলীলায় পানের পিক ছুঁড়ে দেন একান্ত তৃপ্তিতে।

স্টেশন সবে ঝাঁট দেওয়া হয়েছে। পৌরসভা এইমাত্র রাস্তা ঝাঁট দিয়ে জঞ্জাল নিয়ে গেছে। চারপাশের পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন পরিবেশের মধ্যেই বেশ ভাল পোষাক পরিচ্ছেদ পরিহিত যুবক/বয়স্ক মানুষ বা মধ্যবয়সী কোন পুরুষ চলতি রাস্তায় কোন লাজ লজ্জা/সভ্যতার বালাই না রেখে একান্তে থুতু, কফ ফেললেন। একটু পাশে সরে গিয়ে নালা নর্দমায় বা ডাস্টবিনে থুতু-কফ-সর্দি-পোঁটা ফেলা উঠেই গেছে। যে গুটিকয়েক হাতে গোনা সংস্কৃতি সম্পন্ন মানুষ এখনও এসব বিষয়ে সুভদ্র আচরণে অভ্যস্ত, তাঁদের পক্ষে বর্তমান পরিস্থিতিতে রাস্তায় চলাফেরা এক বিষম দায় হয়ে উঠেছে। এ কারণে টিবি রোগের সংক্রমন দ্রুত বাড়ছে।

৩০/৪০টা মাইক খাটিয়ে তারস্বরে চিৎকার চলছে কোনও রাজনৈতিক দলের সভায়। কার ঘাড়ে কটা মাথা আছে যে বলতে যাবে। সপ্তাহে ৩/৪ দিন প্রতিটি এলাকার স্টেশন/বাজার/বাসস্ট্যান্ডে বেলা ৪টে থেকে রাত ৯টা এই অমায়িক প্রচার তান্ডব শুধু উপস্থিত মাত্র নয়; জনজীবনকে এরা কতটা কলুষিত করছে তার কি কোন পরিমাপ আছে? সঙ্ঘবদ্ধ রাজনৈতিক দল বা ক্লাবগুলো পরিবেশ যে ধরনের আচরন পালন করে, তাও যথেষ্ট সমালোচনার বিষয়। দুর্গাপূজা, কালী পূজা, জগদ্ধাত্রী পূজা এবং আরও হাজারো পূজা ধামাকায় (প্রতি শনিবার বড় ঠাকুর ইত্যাদি) যে মাইকের অত্যাচার এবং পরিবেশ অনাচার ঘটে তার প্রতি যুক্তিগ্রাহ্য কোন উত্তর খুঁজে পাওয়া যাবে কি? শিশুরা কিশোর-মধ্যবয়সী যুবকেরা এসব দেখে কী শিখছে, সেটা কি আমরা কখনও ভেবে দেখি।

এইসব দুর্বিসহ অনাচার থেকে রোগবালাইয়ের প্রকোপ বাড়ছে। ভারতে ক্যান্সার রোগে মৃত্যুর অর্ধেক ঘটে তামাকজনিত বিষক্রিয়ায়। এসব জেনেও আমাদের কোনও ভ্রুক্ষেপ নেই বরং হাজারো কুটুক্তির নিপুণ প্রয়োগে আমাদের দক্ষতা দেখলে বিস্ময় লাগে। সচেতনতা কথাটা

গন কু-অভ্যাস

৬ পাতার পর

এখন ক্লিশে। চাই সক্রিয়তা। সুঅভ্যাস আচরণে সক্রিয় সাংগঠনিক প্রয়াস চাই। প্রয়োজনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি। সরকারি শাসন ব্যবস্থাকে উপেক্ষা করে কোনও সমান্তরাল পৃথক ব্যবস্থায় সাফল্য দূর অস্ত। পুলিশ প্রশাসন জনসাধারণ একত্রে এইসব অনাচার রোধে রাস্তায় নামবে। নিয়মিত টহলদারিও রাখতে হবে। নাটক, বিবিধ সাংস্কৃতিক বোধসম্পন্ন প্রচারমূলক কর্মসূচি থাকতেই পারে কিন্তু সর্বোপরি কঠোর নজরপরিব্যবস্থাতে সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে হবে, ট্রেনের টিকিট পরীক্ষায় 'চেতনা' ব্যবস্থা এক্ষেত্রে বিশেষ ভাবে স্মরণীয়। 'পাঁচ আইন' বলে একটা নাগরিক বিধি থাকলেও চারপাশের অরাজকতায় সরকার নিজেই ভয় পায় এসব আইন প্রয়োগে।

শেষ করি, আরও একটা উৎকট অসভ্যতার অতি নগ্নরূপের কথা দিয়ে 'অশ্লীল শব্দটা' এখন যেন একেবারে জলভাত। বাবা ছেলেকে বলছে, ছেলে একটু পিছনে গিয়ে বাবাকে বলছে। স্কুল পড়ুয়া ছাত্র বন্ধুদের প্রতি দুটি শব্দের মধ্যে একটি হল যৌন শব্দ যা সামাজিক শিষ্টাচারের নিরিখে অশ্লীল শব্দ হিসাবে পরিগণিত। রাস্তাঘাটে আপনি যদি স্বচ্ছন্দ ভাবে চলাফেরা করতে চান, তাহলে আপনাকে মানিসকভাবে নির্যাতিত (পড়ুন-র‍্যাগিং) হতেই হবে। ট্রেনে উঠেছি। বছর ২৫/৩০ এর চারজন যুবক অনর্গল নিজেদের মধ্যে উচ্চগ্রামে অশ্লীল শব্দ উচ্চারণ করে যাচ্ছে। ভর্তি ট্রেন। মা-দিদি-বোনেরাও শুনছেন। কেউ কিন্তু কোন প্রতিবাদ করছে না। অসহ্য হয়ে বলতে বাধ্য হলাম। উত্তর এল ব্যঙ্গাত্মক। অসুবিধা হলে উঠে অন্য কোথাও যান এমন তাচ্ছিল্যের প্রত্যুত্তর। ট্রেনের অনেক সুভদ্র মানুষ বিষয়টা দেখলেন বা শুনলেন কিন্তু কোন প্রতিবাদে এগিয়ে এলেন না। মানুষ কি ক্রমেই নির্জিব নির্বোধ, সরলরৈখিক হয়ে যাচ্ছে। সামাজিক দায়বদ্ধতা বলে এখন আর কিছুই কি নেই! ট্রেনে, বাসে, পাড়ায় সন্দেহভাজন পকেটমার ধরে পেটাতে আমরা খুব ভালবাসি। একাজের সুপ্ত রূপায়নে আছে আমাদের প্রবল উৎসাহ, ভরপুর উদ্যম। কিন্তু হাজারো সামাজিক অরাজকতায় পাড়ার তোলাবাজ, মাস্তান, দৌরাত্মকারীদের বিরুদ্ধে আমরা চুপচাপ। ভাজা মাছ উল্টে খেতে না জানা অতি সুবোধ বালক মাত্র। ইভটিজিং এর প্রতিবাদ করে কতজন খুন হয়ে গেছেন, তার হিসেব সকলেরই জানা।

মদ্যপান জনিত অসভ্যতা বা মাতলামি এখন এতটাই গা সওয়া ব্যাপার হয়ে গেছে যে এনিয়ে কিছু কেউ বলতে পারে এটা এখন কেউ ভাবেই না। পাশ কাটিয়ে চলে যাও। ঝামেলায় জড়িয়ো না এই হল বুদ্ধিমানের জীবনদর্শন। যারা বোকা তারা একটু ফিসফাস করার চেষ্টা যে একেবারেই করে না, এমন নয়। কিন্তু চালাকরা জানে এসবদের টিকি উপরের শক্তিমান স্তরে নির্ভরযোগ্যমানে ধরা বাঁধা আছে। শীতকালীন চড়ুইভাতি একটি মজার উৎসব বিশেষ। এখানে মাইক বাজিয়ে অশালীন নৃত্যগীত আপনাকে চরম বিরক্তিতে ভরিয়ে দেবে। এখন বনভোজনে 'পানভোজন' একটি অবশ্যক পদ বিশেষ।

বাঙালি রবীন্দ্রভক্ত বা রবীন্দ্রনাথের পূজারি। সত্য-সুন্দরের আরাধনায় রবীন্দ্রনাথ আজও পথপ্রদর্শক। পাড়ায় পাড়ায়, স্কুলে-কলেজে, হাজারো গণ সংস্কৃতি মঞ্চে সুন্দরের ভাবনাকে, সুশীল সমাজচিন্তাকে তুলে ধরা হোক। বাণিজ্যিক পত্রপত্রিকা ও খবরের কাগজের পাতায় যৌন উত্তেজক ছবি ছাপার বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে উঠুক। যুব সমাজকে পথ দেখাতে গঠনমূলক সৃজন ভাবনা অত্যাবশ্যক।

লেখক ঃ দীপক কুমার দাঁ, গোবরডাঙ্গা, উঃ ২৪ পরগণা
ফোন ঃ ৯৪৭৪১৯২৭৯৯

রঙিন মাছ

1 পাতার পর

ক্রমশ ফুলে যাচ্ছে ঠোঁট, সাদা থেকে হলদেটে হয়ে যাচ্ছে তার অবস্থান, মুখ বন্ধ করতেও কষ্ট ফলে শ্বাসক্রিয়ায় ব্যাঘাত ঘটে খাওয়াও প্রায় বন্ধ। এই অবস্থায় অবলা জীবটিকে নিয়ে কি করবেন ভেবে না পেয়ে সাথে সাথে ফোন করুন এই ঠিকানায়। না মানুষের ঠোঁট নয়, রঙিন মাছের ঠোঁট। যারা এ্যাকোয়ারিয়ামে মাছ পোষেন তাঁরা জানেন মাছের মুখের এই রোগটির নামে মাউথফাঙ্গাস। সময় বিশেষে মারত্মক এই রোগ। এ্যাকোয়ারিয়ামের অন্য মাছেরাও সংক্রামিত হতে পারে এই রোগে।

যাঁরা এ্যাকোয়ারিয়ামে মাছ পোষেন তাঁরা এ্যাকোয়ারিয়ামটাকে ঝাঁ-চকচকে করবার দিকে বিশেষ নজর দেন। কিন্তু ভেতরকার যন্ত্রাংশের দিকে তাঁদের বিশেষ নজর নেই। যেমন ওয়াটার ফিল্টার, এটি রুটিন মাফিক পরিষ্কার করা দরকার। জল ভাল থাকলে মাছ ভাল থাকবে। কিছুদিন পরপর এটা পরিষ্কার না করলে মাছেরা খাওয়া বন্ধ করে দেবে এবং ঝিমিয়ে পড়বে।

সারাদিন এই নিয়েই থাকেন পতিত পাবনবাবু। কারুর পাখনা খসে যাচ্ছে, কারুর লেজ পড়ে গেছে কেউ স্বাভাবিকভাবে চলাফেরা করছে না, কেউ খাচ্ছে না। কুছ পরোয়া নেই। পতিত পাবনবাবু ঠিক করে দেবেন। ১৫০ বর্গফুট জায়গায় ২২টি বড় এ্যাকোয়ারিয়াম রেখে অসুস্থ মাছের চিকিৎসা চলছে।

১৯৯৯ সালে একটি বই প্রকাশ করেন পতিতপাবনবাবু। বইটির নাম 'রঙিন মাছের পরিচর্যা ও রোগমুক্তি'। বাংলা, হিন্দি ও ইংরেজি সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে বইটির।

যদি কেউ বাড়িতে মাছের পরিচর্যার কেন্দ্র বা চিকিৎসা কেন্দ্র গড়ে তুলতে চান তবে সব-রকমভাবে সাহায্য করবেন এই মানুষটি। আসলে এই ধরণের বহু প্রতিভা ছাড়িয়ে আছে এদিক ওদিক। তাঁদের খবর কে বা রাখে। আমার ছোটোবেলায় টুকটুকি ফুরফুরিও মারা যেত না যদি এরকম একজন সহৃদয় ডাক্তারবাবুকে পেতাম।

লেখক ঃ বিবর্তন ভট্টাচার্য
চাকদহ বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থা
মোঃ ৯৪৩৪১১০৯৬৯

ওজন স্তর ও আমরা

পৃথিবীর সমুদ্র সমতল থেকে১২ কি.মি উপর পর্যন্ত ট্রপোস্ফিয়ার নামক একটি বায়ু মন্ডলীয় স্তর। এরপর পরবর্তী ৫০ কি.মি উচ্চতা পর্যন্ত পরে বায়ু মন্ডলের 'স্ট্রাটোস্ফিয়ার' নামক পরবর্তী স্তর। এই স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার স্তরের মধ্যে আনুমানিক ২০ থেকে ২৬ কি.মি. পর্যন্ত ওজন (O_3) নামক একটি নীলাভ বর্ণের তীব্র আঁশটে গন্ধ যুক্ত গ্যাসের স্তর রয়েছে যাকে ওজনস্তর বলা হয়। প্রতি নিয়তই বায়ু মন্ডলের বাইরে বহির্মহাকাশ থেকে বিচ্ছুরিত বিভিন্ন ক্ষতিকর রশ্মি, সূর্য থেকে আসা অতিবেগুনি রশ্মির হাত থেকে প্রাণী ও উদ্ভিদকূলকে রক্ষা করে এই 'ওজনস্তর'।

ওজনের মধ্যে রয়েছে অক্সিজেন এর তিনটি পরমাণু। অন্যদিকে অক্সিজেন গ্যাসের একটি অণুর মধ্যে পরমাণু সংখ্যা দুই। সূর্য থেকে বিচ্ছুরিত অতি বেগুনি একদিকে যেমন ওজনকে অক্সিজেন ভেঙে ফেলে অন্যদিকে অক্সিজেন থেকে ওজন গঠন করতেও সাহায্য করে। স্ট্র্যাটোসস্ফিয়ারে ওজনের পরিমানে একটি সাধারণ ভারসাম্য বজায় থাকে। ওজনস্তর বিষুবরেখা বা নিরক্ষরেখার কাছাকাছি স্থানে তুলনামূলকভাবে পাতলা।

আবার অন্যদিকে মেরু অঞ্চলে মোটামুটি ভাবে মোটা বা ভারী (উলম্বভাবে বিষুব অঞ্চলে ০.২৯ সে.মি এবং মেরু অঞ্চলে ০.৪০ সে.মি গভীর প্রায়)। যদিও বিষুব অঞ্চলেই অধিক পরিমাণে ওজন তৈরি হয় কিন্তু বায়ুমন্ডলীয় চাপে, মেরুর দিকে বেশি ধাবিত হয়। ঋতু পরিবর্তনের সাথে সাথে এর পরিমানও পরিবর্তিত হয়। বসন্তকালে (সাধারনতঃ ফেব্রুয়ারী - এপ্রিল) অধিক পরিমাণে এবং শীতকাল বাদে অন্য সময়ে (জুলাই-অক্টোবর) কম পরিমাণে সংশ্লেষিত হয়।

ওজন ছিদ্র

সূর্যের অতি বেগুনী রশ্মি সাধারণত পৃথিবীতে প্রাণ সৃষ্টিতে মুখ্য ভূমিকা পালন করলেও, এই ওজন স্তর এই অতিবেগুনী রশ্মির হাত থেকে বসুন্ধরাকে তার ক্ষতিকর প্রভাব থেকে মুক্ত রাখে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই!

১৯৮৫ সাল নাগাদ ডঃ জে.সি. ফারমেন এবং তাঁর সহকর্মীরা অ্যান্টার্কটিকায় প্রথমবারের জন্য 'ওজন স্তরে ছিদ্র' লক্ষ্য করেন। 'ওজন স্তর ছিদ্র' এইস্তরের ক্ষয়প্রাপ্ত হওয়ার একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ হিসেবে পরিজনিত হয়। একটি হিসেব থেকে জানা যায়, শুধুমাত্র উত্তর গোলার্ধেই ১৯৬৯ থেকে ১৯৮৮ সালের মধ্যে অন্ততঃ ৩ থেকে ৬ শতাংশের মতো ওজন স্তর ক্ষয়ীভূত হয়েছে।

ওজন ছিদ্রের কারণ

এক কথায় বলতে গেলে বলতে হয় এই ওজন স্তর ধ্বংস করছে আমাদের আধুনিক তথাকথিত উন্নত সভ্যতা। অধিকাংশ গ্রীন হাউস গ্যাস যেমন ক্লোরোফ্লুরো কার্বন (সিএফসি), হাইড্রো ফ্লুরো কার্বন (HFC), মিথেন, নাইট্রাস অক্সাইড (NO) প্রভৃতি ওজন স্তরের ক্ষয়ের সাথে সম্পর্ক যুক্ত। হাইড্রোক্সিল আয়ন (OH) শুধুমাত্র ১০ শতাংশ হারে ওজন স্তর ক্ষয় ঘটাতে সক্ষম। আবার নাইট্রোজেনের বিভিন্ন অক্সাইড যেমন—নাইট্রোজেন ডাই অক্সাইড (N_2O) এবং নাইট্রিক অক্সাইড ওজন স্তরে বিপুল পরিমাণে ক্ষয় ঘটাতে পারে। এইসব নাইট্রোজেনের অক্সাইড প্রধানত প্রাকৃতিক উপায়েই সাগর জলে এবং মাটিতে থাকা অনুজীবের দ্বারা নাইট্রেট লবনের বিয়োজনের দরুন তৈরি হয়। তবে, জেট বিমানের জ্বালানি থেকে নির্গত পরিত্যক্ত বায়ুতেও নাইট্রোজেনের বিভিন্ন অক্সাইড থাকে। ক্লোরো ফ্লুরো কার্বন (CFC), রাসায়নিক সার থেকে উৎপন্ন নাইট্রোজেন অক্সাইড এবং বিভিন্ন বিমান থেকে নির্গত গ্যাস (ট্রপোস্ফিয়ারে যাতায়াত করতে যেয়ে প্রায়শই: স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারে প্রবেশ করে)। এই গ্যাসগুলি অতিবেগুনি রশ্মির প্রভাবে ভেঙে গিয়ে ক্লোরিন (Cl) তৈরি করে। একটি হিসেব বলছে ক্লোরিনের একটি পরমাণু অন্ততঃ ওজনের এক লক্ষ অনু ধ্বংস করতে সক্ষম (তবে প্রয়োজনে পাঁচ লক্ষ্য অণুকেও ধ্বংস করতে পারে)। ওজন ভাঙার চক্রান্তে ক্লোরিন অণু অনুঘটকের মত কাজ করে।

রেফ্রিজারেটর, এয়ার কন্ডিশনার, কয়েকটি বিশেষ ধরণের আঠা এবং কিছু কিছু প্যাকেজিং পদ্ধতিতে CFC উৎপন্ন হয়। বর্তমানে CFC-র বদলে HFC ব্যবহার করা হচ্ছে। কিন্তু HFC ও একটি মারাত্মক গ্রিন হাউস গ্যাস যা পরিবেশের পক্ষে ক্ষতিকর। এই HFC কার্বন ডাই অক্সাইডের তুলনায় প্রায় ১২০০ গুণ বেশি শক্তিশালী। অবশ্য এখন আবার, HFC-র বদলে হাইড্রোকার্বন, যেমন আইসোবিউটেন, প্রোপেন ইত্যাদি ব্যবহার করার চেষ্টা চলছে।

সি.এফ.সি ব্যবহার করার একটি পরিসংখ্যান বলছে যেখানে মার্কিনযুক্তরাষ্ট্র পৃথিবীর মোট ৩০ ভাগ নিজেদের দেশে ব্যবহার করে সেক্ষেত্রে ভারত ও চীন এক সঙ্গে ব্যবহার করে মাত্র ২ ভাগ। এটাই আমাদের জন্য আপাততঃ স্বস্তির।

জীবদেহের ওপর প্রভাব

পরীক্ষা থেকে জানা গেছে, অতিবেগুনী রশ্মির প্রভাবে চামড়ায় ক্যান্সারের প্রবনতা বৃদ্ধি পায় এবং চোখের মারাত্মক ক্ষতি হয়। চোখের কর্নিয়া নষ্ট হয়ে যায়, ত্বকে প্রতিরোধ ক্ষমতা নষ্ট হয় ফলে ব্যাক্টেরিয়া, ভাইরাস কিংবা ছত্রাক ইত্যাদির দ্বারা আক্রান্ত হয়ে বিভিন্ন প্রকার চর্মরোগ দেখা দেয় এবং প্রজনন ক্ষমতাও কমে আসে। এতে প্রাণীর স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও বংশ বিস্তার ব্যাহত হয়। অনাক্রমতা (রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতা) কমে আসে। উদ্ভিদের ক্ষেত্রে স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও ফলন ব্যাহত হয়। ফাইটোপ্লাংকটন এর বৃদ্ধি ব্যাহত হওয়ার জন্য সামুদ্রিক বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্য বিঘ্নিত হয়।

এরপর ৭ পাতায়

ওজনস্তর ও আমরা

৪ পাতার পর

সমস্যা মুক্তির উপায়

১) ওজন ধ্বংসকারী ক্লোরিনের মুখ্য উৎস হল CFC যার বানিজ্যিক নাম ফ্রিয়ন। এদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো বায়ু মন্ডলে উপস্থিত অন্যান্য কোনো পদার্থের সঙ্গে নিহত বিক্রিয়া করে না কেবল মাত্র ওজন ছাড়া। শুধু তাই নয়, বায়ুমন্ডলে এরা দীর্ঘদিন অপরিবর্তিত অবস্থায় থাকতে পারে। কাজেই আমাদের ভোগবাদী মানসিকতা বর্জন করে যে সমস্ত সূত্র থেকে এই গ্যাসটি উৎপন্ন হয় যেগুলো ব্যবহারের ক্ষেত্রে লাগাম টানা --- পারলে ব্যবহার বর্জন কর।

২) প্লাজমা পদার্থবিদ্ আলফ্রেড ওয়ং ওজন স্তর ক্ষয়রোধে একটি নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছেন। তাঁর তত্ত্ব অনুযায়ী যদি ক্লোরিন পরমাণুকে ঋণাত্মক তড়িতাহিত করা হয়, তাহলে ওজনের প্রতি ক্লোরিনের আসক্তি প্রশমিত হবে। এইতত্ত্ব মেনে বিভিন্ন ব্যবহারিক প্রতিষ্ঠান CFC যুক্ত পরিমিত মাত্রায় প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি তৈরি করতে পারেন।

৩) CFC ব্যবহারের পুরোনো পদ্ধতির প্রতিস্থাপন করতে হবে নতুন প্রযুক্তি ব্যবস্থার মাধ্যমে। ক্লোরিন, ফ্লোরিন ইত্যাদি হ্যালোজেন গ্যাস উৎপাদন এবং ব্যবহারকারি শিল্পেও নতুন প্রযুক্তির ব্যবহার করে এগুলির উৎপাদন ও ব্যবহার বন্ধ করতে হবে।

মন্ট্রিল চুক্তি

ওজনস্তরের ক্ষয়ের রোধে ১৯৮৭ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর সারা বিশ্বের ১১টি দেশ মিলে ক্যানাডার মন্ট্রিল শহরে একটি চুক্তিপত্র স্বাক্ষর করে। এটাই একক ভাবে শুধুমাত্র ওজনস্তরের ক্ষয় রোধে আন্তর্জাতিক প্রথম ব্যবস্থা। চুক্তিটি বলবৎ হয় ১৯৮৯ সালের ১লা জানুয়ারী থেকে। চুক্তি অনুযায়ী সদস্য প্রতিটি দেশ নিম্নলিখিত বিষয়গুলো মেনে চলবে—

১) CFC ব্যবহার ১৯৯৫ সালে ৫০ শতাংশ কমানো হবে, ১৯৯৭ সালে ৮৫ শতাংশ এবং ২০০০ সাল নাগাদ এর ব্যবহার সম্পূর্ণ বন্ধ করা হবে।

২) ক্লোরিন জাতীয় গ্যাসের উৎপাদন ধাপে ধাপে কমিয়ে ২০০০ সালে সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করা হবে।

৩) কার্বন টেট্রা ক্লোরাইড (CCl_4) এর ব্যবহার ২০০০ সালে বন্ধ করা হবে।

৪) মিথাইল ক্লোরোফর্ম এর ব্যবহার ২০০৫ সালের মধ্যে বন্ধ করা হবে।

তবে আজ ২০১১ সালেও বাস্তব অভিজ্ঞতা অন্য কথা বলে। যাই হোক, এখনও সময় থাকতে 'ওজন সমস্যা' কে আন্তর্জাতিক ও জাতীয় সমস্যা হিসেবে না ভাবলে পৃথিবীর উপর প্রতিটি জীবেরই অস্তিত্ব সংকটের মুখে পড়বে।

লেখক ঃ রাজা রউত, জলপাইগুড়ি সায়েন্স এন্ড নেচার ক্লাব
ফোন ঃ ৯৪৭৪৪১৭১৭৮,
Email : rajarouthbhbl@gmail.com

তথ্যসূত্র ঃ— মনোরমা ইয়ারবুক, ২০০৮

রিপোর্ট

হিরোসিমা দিবস

পরমাণু বোমা ও পরমাণু বিদ্যুৎ দুটোই বিশ্বে বিপদজনক সংকট ডেকে আনছে। সম্প্রতি এধরণের সংকটের নাম ফুকুশিমা।

পরমাণু বিদ্যুৎ নিয়ে ভাওতা ও বিভ্রান্তির যাবতীয় মুখোশ খুলে দিয়ে নিরাপদ, পরিবেশবান্ধব ও সস্তা বিকল্প বিদ্যুতের প্রচেষ্টার কথা তুলে ধরা হয়েছে। 'পরমাণু বিদ্যুতের বিকল্প চাই' শীর্ষক বইটিতে ৬ আগস্ট হিরোশিমা দিবসে ৩২টি বিজ্ঞান সংস্থার উদ্যোগ কলিকাতা কফি হাউসের তিনতলা র‍্যাডিক্যাল সোসাইটির ঘরে মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে 'পরমাণু বিদ্যুতের বিকল্প চাই' শীর্ষক বইটি উদ্বোধন হয়।

কাঁচরাপাড়া বিজ্ঞান দরবার ও বিজ্ঞান অন্বেষকের পক্ষে জয়দেব দে বইটির প্রকাশ অনুষ্ঠানে বলেন পরমাণু চুল্লি পরমাণু বিদ্যুৎ বিরোধী ধারাবাহিক প্রচারের হাতিয়ার হিসেবে বইটি রাজ্য জুড়ে ছড়িয়ে দেওয়া হবে। লেখক সুরেশ কুন্ডু, চাকদহ বিজ্ঞান সাংস্কৃতিক সংস্থার কর্মী বিবর্তন ভট্টাচার্য, চন্দনসুরভি দাস, সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায় ও বিশিষ্ট বিজ্ঞানী সমর বাগচী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানে সুতপা বন্দ্যোপাধ্যায় গান পরিবেশন করেন।

নাগাসাকি দিবস

কাঁচরাপাড়া বিজ্ঞান দরবারের উদ্যোগে ৯ আগস্ট নাগাসাকি দিবসে স্থানীয় রেল স্টেশনে পরমাণু চুল্লি বিরোধী প্রচারাভিযানের আয়োজন করা হয়। প্রচারপত্র সহ বক্তব্য রাখেন সম্পাদক সুরজিৎ দাস, কিঞ্জল বিশ্বাস, জয়দেব দে প্রমুখ। বক্তারা দাবি করেন ভারতবর্ষে মাত্র ৩ শতাংশ বিদ্যুৎ পরমাণু চুল্লি থেকে পাওয়া যায়। পাশাপাশি বিকল্প ও নবীকরণযোগ্য উৎস থেকে অনেক বেশী পরিমাণে বিদ্যুৎ পাওয়া যায়।

বিস্মৃত প্রায় বাঙালি বিজ্ঞানী

5 পাতার পর

দুঃখ ও পরিতাপের বিষয়, মানিকলাল তাঁর চাকরি ক্ষেত্রে যেসব মৌলিক গবেষণা করেছিলেন, বর্তমান লেখক তার কিছুই উল্লেখ করতে পারেননি। আগামী দিনের কোনও গবেষক এ সম্পর্কে আলোকপাত করতে পারেন।

লেখক ঃ রণতোষ চক্রবর্তী, নবপল্লী, শিবতলা, বারাসাত
উত্তর ২৪ পরগণা।
ফোন ঃ (০৩৩) ২৫৪২ ১১৬৭

তথ্য সংগৃহীত হয়েছে ঃ আত্মচরিত, প্রফুল্লচন্দ্র রায়
পাক্ষিক বসুমতী; ১৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৩
মানিকলাল দে-র ভ্রাতুষ্পুত্র প্রয়াত দিলীপ কুমার দে ও তাঁর পুত্র প্রলয় দে।

লোভনীয় খাবারে ট্রান্স ফ্যাট

কিছু কিছু খাদ্য প্রস্তুতকারী সংস্থা রাসায়নিক পদ্ধতিতে উদ্ভিজ তেলকে আংশিক ভাবে হাইড্রোজেন সম্পৃক্ত করেন, কারন এর ফলে ঐ তেল গ্রহণ যোগ্য হয়, খাবারের সঙ্গে সহজে মিশে যায় ও সহজে নষ্ট হয় না। যথারীতি এই পদ্ধতি প্রয়োগের ফলে ঐ ফ্যাট এর কিছু কিছু অসম্পৃক্ত ফ্যাটি অ্যাসিড, ট্রান্স ফ্যাটি অ্যাসিডে রূপান্তরিত হয়। ধরা যাক ওলিক অ্যাসিড, এটি একটি মাত্র ডবল বন্ড যুক্ত মনোআনস্যাটুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিড। সাধারণ ভাবে প্রকৃতিতে এটি 'সিস' (Cis-Configuration) আকৃতিতে পাওয়া যায়। হাইড্রোজেনের উপস্থিতিতে এই সম্পৃক্তি (Hydrozenation) করনের ফলে এটি 'সিস' ফ্যাটি অ্যাসিড এই আকৃতি থেকে ট্রান্স ফ্যাটি অ্যাসিডে পরিবর্তিত হয়। (চিত্র নং ১)

তেল বা অন্যান্য স্নেহ জাতীয় পদার্থ যা আমরা খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করি সেগুলির বেশির ভাগই ট্রাই গ্লিসারাইড/ট্রাইঅ্যাসিল গ্লিসারল। হজমের পর গ্লিসারলের সঙ্গে যুক্ত ফ্যাটি অ্যাসিডগুলিঃ যেমন স্যাটুরেটেড (সম্পৃক্ত), সিস-আনস্যাটুরেডেট ও ট্রান্স-আনস্যাচুরেটেড গ্লিসারল থেকে মুক্ত হয়, পরে শোষনের পর আবার ফ্যাট এ রূপান্তরিত হয় ও রক্তে বাহিত হয়ে কোষে পৌছে শক্তি বিপাক, শক্তি সঞ্চয় ও অন্যান্য কাজে অংশ গ্রহণ করে। কিন্তু বিভিন্ন ডাক্তারী পরীক্ষায় ও গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে টান্স ফ্যাট হৃৎপিন্ডের কার্যকারিতা নষ্ট করে। খাদ্যের সঙ্গে এই ফ্যাট গ্রহণের ফলে, হৃৎপিন্ডের রক্ত বহনালীগুলি আক্রান্ত হয়, এদের রক্ত বহন ক্ষমতা কমে যায়। যুক্তরাষ্ট্রের হার্ভাড বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা একটি জন সমীক্ষায় দেখিয়েছেন যে ঐ দেশে ট্রান্স ফ্যাট গ্রহণের ফলে প্রতি বছর প্রায় ৩০,০০০ মানুষের করোনারী হার্টের অসুখে অকাল মৃত্যু ঘটছে। এক্ষেত্রে রক্তের স্নেহ পদার্থ লিপিড বিশ্লেষণ করে দেখা গিয়েছে যে ট্রান্স ফ্যাট রক্তের লিপিডের ওপর একটি প্রতিকূল প্রভাব বিস্তার করে 'এলডিএল' বা লোডেনসিটি লাইপোপ্রোটিন অর্থাৎ খারাপ কোলেস্টারলের মাত্রা বৃদ্ধি করে আর 'এইচ ডি এল' বা হাইডেনসিটি লাইপোপ্রোটিন বা ভাল কোলেস্টারলের মাত্রা কমিয়ে দেয়। ফলে হৃৎপিন্ডের কার্য ক্ষমতা নষ্ট হয়। স্যাটুরেটেড ফ্যাট বা সম্পৃক্ত ফ্যাটকে আমরা রক্তে কোলেস্টেরল বৃদ্ধির কারণ হিসাবে দোষী সাব্যস্থ করি, কিন্তু ট্রান্স ফ্যাট এর প্রভাব এর দ্বিগুন।

যুক্তরাষ্ট্রের ফুড এন্ড ড্রাগ এডমিনিস্ট্রেসান, ২০০৬ এর জানুয়ারী ১ থেকে সে দেশে উৎপন্ন প্রস্তুত (Processed Food) খাদ্যের উপর নির্দিষ্ট ভাবে ট্রান্স ফ্যাট এর মাত্রা লিখে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে। যেমন নানান ধরণের চিপস, আলু ও অন্যান্য ভাজা, ডোনাট, বিস্কুট, অর্থাৎ যে খাবারগুলি খুব লোভনীয় আর চটজলদি খাওয়া যায়। আমাদের দেশের খাদ্য প্রস্তুতকারী সংস্থাগুলি খাদ্যের ওপর ট্রান্সফ্যাট এর অনুপস্থিতির কথা ঘোষণা করছে। এরা সবাই নামী দামি সংস্থা। কিন্তু অনেক প্রস্তুত খাদ্যেই এর উল্লেখ থাকে না। তাই সাধারণ জনমানসে এই ব্যাপারে সচেতনতার প্রয়োজন।

১নং চিত্র : ওলিক অ্যাসিডের আনবিক ফর্মুলা —
(১), হাইড্রোজিনেসানের ফলে আণবিক আকৃতির
(২) পরিবর্তন দেখান হল

১) $C_{18}H_{34}O_2$

অথবা

$CH_3(CH_2)_7CH{=}CH(CH_2)_7COOH$

2)

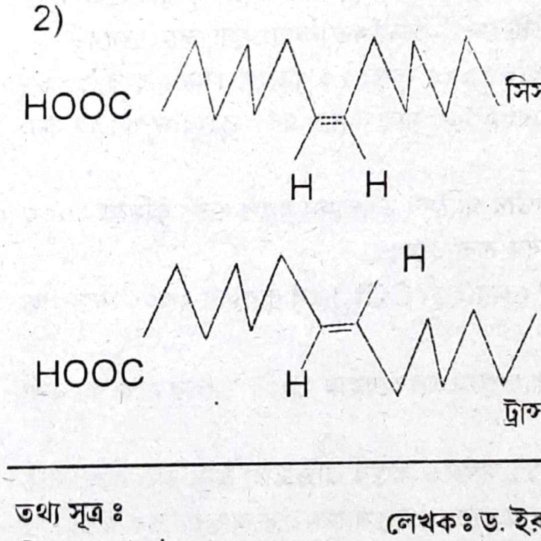

সিস ওলিক অ্যাসিড

ট্রান্স ওলিক অ্যাসিড

তথ্য সূত্র ঃ
Concepts in Bicchemistry
R. Boyer
John Wiley & Sons, Inc, 2006

লেখক ঃ ড. ইরা ঘোষ
১/৫ পূর্বাচল ক্যানাল
সাউথ রোড
কলকাতা-৭০০০৭৮
ফোন ঃ (০৩৩) ২৪৮৪-২৮৯৭
মোঃ ৯৭৪৮১০১২৯১

$\frac{C}{5}=\frac{F-32}{9}$ এর বিকল্প সমীকরণ

শকুন্তলা দেবীর 'দ্য বুক অব্ নাম্বারস্' নামের বইয়ে সেন্টিগ্রেড ও ফারেনহাইট স্কেলের সকলের জানা প্রচলিত সমীকরণের সম্পর্কের একটা বিকল্প সমীকরণ আছে। সমীকরণটি হল : $\frac{C+40}{F+40}=\frac{5}{9}$

বইতে এর প্রমাণটা কিন্তু করে দেওয়া নেই। প্রমাণটা কোনও বইতে থাকলেও থাকতে পারে আবার অনেকেরই হয়ত বা অজানা নয়। স্কুলে পড়ার সময় এর প্রমাণটা করেছিলাম এবং সেটা এখানে পাঠকদের জন্য তুলে দিলাম।

প্রমাণ :— আমরা জানি, সেন্টিগ্রেড ও ফারেনহাইট স্কেলের উর্ধ্বস্থিরাঙ্ক যথাক্রমে 100^0C এবং 212^0C এবং দুটি স্কেলেই -40^0C বা -40^0C এ উষ্ণতার পাঠ সমান হয়। মনে করি একটি নির্দিষ্ট উষ্ণতায় মান সেন্টিগ্রেডে C এবং ফারেনহাইটে F। দুটি স্কেলেরই উর্ধ্ব বা নিম্নস্থিরাঙ্ক এবং C ও F এর সঙ্গে -40 ডিগ্রী অন্তরে পাঠের সঙ্গে পারস্পরিক অনুপাত সমান হবে (ছবি অনুযায়ী) । অর্থাৎ

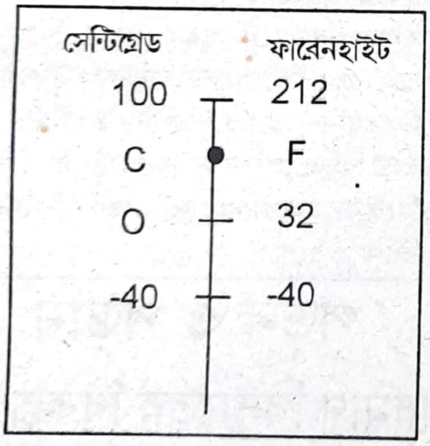

$$\frac{100-(-40)}{C-(-40)}=\frac{212-(-40)}{F-(-40)}$$

বা, $$\frac{5}{C+40}=\frac{9}{F+40}$$ (সমাধান করে)

$$\therefore \frac{C+40}{F+40}=\frac{5}{9}$$ (প্রমানিত)

পাঠ্যপুস্তকে আমরা যে সমীকরণ জেনেছি এটি তার সম্পূর্ণ বিকল্প এবং বেশ মজারও। তাই নতুন সমীকরণের সাহায্যেও অঙ্ক করা যায় নাকি?

লেখক : তুষার কান্তি গলুই, ফোন : ৯৬৩৫৯৩১৩৬২

রিপোর্ট

বন দপ্তরের উদাসীনতার ফল

গত ৩১/০৭/২০১১ শান্তিপুর থানার এক আধিকারিক সন্দেহজনক অবস্থায় বাইপাস থেকে একটি গাড়ি উদ্ধার করেন। মুখ বন্ধকরা একটি চায়ের পেটির মধ্যে কিছু পাখি ছিল সেই বাক্সটির ছিদ্র দিয়ে এইটুকুই বোঝা সম্ভব হয়। সেই দিন রাত্রিরে কৃষ্ণনগর বন বিভাগ বিভাগীয় আধিকারিকের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করতে গেলে তিনি ফোন ধরেননি। কৃষ্ণনগর রেঞ্জ আধিকারিকের সঙ্গে যোগাযোগ করলে তিনি জানান আগামীকাল সকালে আমাদের কর্মীরা যাবেন আমাদের পাখিগুলি উদ্ধার করতে। এছাড়াও বেথুয়া বনবিভাগ বাহাদুরপুর বনবিভাগ আধিকারিকদের সঙ্গে যোগাযোগ করে বারবার সেইদিন রাত্রিরে আসার অনুরোধ করলেও তারা আসেননি। পরের দিন সকালে তারা এসে যখন বন্দি বাক্স খুললেন তখন ইতিমধ্যেই পাঁচটি পাখি মারা গেছে।

পরে খোঁজ খবর নিয়ে জানা যায় সেই পাখিগুলি আফ্রিকান বার্ড। একটি পাখি, দুজন আসামী ও গাড়ি সমেত বনকর্মীরা নিয়ে চলে যান থানা থেকে। সঠিক সময়ে বনদপ্তরের কর্মীরা যদি আসতেন তাহলে ওই বিলুপ্ত প্রায় পাখিগুলিকে বাঁচানো সম্ভব হত কেননা তার সঠিক রক্ষণাবেক্ষণ হত। বন্যপ্রাণী রক্ষা করার যে গুরুদায়িত্ব যাদের ওপর তাদেরই যদি এই ভূমিকা হয় তাহলে সাধারণ মানুষ কার কাছেই বা যাবে? আর পুলিশের এত কষ্ট করে উদ্ধার করার সার্থকতাই বা কোথায় রইল? নাকি তাঁরাই (বন দপ্তর) কাউকে আড়াল করতে চাইছেন?

আবার পরে বনবিভাগীয় আধিকারিক (বনকরণ) এর সঙ্গে যোগাযোগ করলে তিনি জানান আমি জানতাম না তাই এরকম ঘটেছে জানলে এটা ঘটত না অথচ সেই দিন রাত্রিরে তাঁকে বারবার ফোন করা হয়েছে তিনি ফোন ধরেননি আবার অপরাধিদের শাস্তি কি দেবেন জানতে চাইলে তিনি বলেন এগুলো তো ভারতীয় পাখি নয় তাই সেভাবে কোন ওদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব নয়। তাহলে কি সত্যিই বন কর্মীরা কাউকে আড়াল করতে চাইছেন?

Raghunath Karmakar,
Shantipur Science Club
32/2, Kanai Pal Street, Shantipur,
Nadia, 741404
M.: 9232828333

৬ আগষ্ট হিরোশিমা দিবস, ৯ আগষ্ট নাগাশাকি দিবস

পরমাণু চুল্লি না—, চাই, বিকল্প শক্তি

বিকল্প শক্তির খোঁজ

সারা বিশ্বে পরমাণু চুল্লি বিরোধী আন্দোলন ক্রমশ দানা বাঁধছে, বিকল্প বিদ্যুতের জন্য আন্তর্জাতিক স্তরে গবেষণা চলছে। ১৯৮৬ সালের পর সারা পৃথিবীতে নতুন করে পরমাণু চুল্লি কোন দেশ স্থাপন করেনি, বহু দেশ আইন করে পরমাণু চুল্লি স্থাপন বন্ধ করে দিয়েছেন।

দরকার বিকল্প শক্তি অর্থাৎ বায়ুশক্তি, জলবিদ্যুৎ ও অচিরাচরিত শক্তির উৎসগুলোকে সঠিক ভাবে কাজে লাগানো, পাশাপাশি তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের (কয়লাভিত্তিক জ্বালানি) ব্যবহার কমাতে হবে। প্রতিটি তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে প্রচুর পরিমাণে কয়লা (জীবাশ্ম জ্বালানি) পুড়িয়ে প্রচুর পরিমাণ কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস বাতাসে মিশে যাচ্ছে।

সারা ভারতে খুব বড় ও মাঝারি জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের সম্ভাবনা ৬৫ হাজার ৫৯৯ মেগাওয়াট। এর মধ্যে ৫০ শতাংশ বা ৩২ হাজার ৩৬৭ মেগাওয়াট উৎপাদন করা যেতে পারে শুধুমাত্র উত্তর পূর্বাঞ্চলের ৮টি রাজ্য থেকে (অসম ৩৫১; অরুণাচল প্রদেশ ২৬.৬৩২; মণিপুর ১০০৬; মেঘালয় ১০৭০; মিজোরাম ১৪৪৮; নাগাল্যান্ড ৯৫৮; সিকিম ১২২৫; ত্রিপুরা ৯)। ২০০৩ সালে কেন্দ্রীয় শক্তিমন্ত্রক ৫০ হাজার মেগাওয়াট জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের এক উদ্যোগ নেয়। দশম পরিকল্পনায় জাতীয় জলবিদ্যুৎ শক্তি নিগম (এন এইচ পি সি) উত্তর পূর্বাঞ্চলের জন্য ৭১৭৪.৯২ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে ৮ হাজার ৯৯০ মেগাওয়াট জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য এবং উত্তর-পূর্ব বিদ্যুৎ শক্তি নিগম (এন ই ই পি সি ও) ২৪৭৮.২ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে ২ হাজার ৭০০ মেগাওয়াট জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য।

সারা ভারতে পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তির উৎসগুলি যথা : (সোলার এনার্জি)—৫,৭০,০০০ মেগাওয়াট (সম্ভাব্য বিদ্যুৎ উৎপাদন); বায়ুচালিত বিদ্যুৎ—৩০,০০০-৫০,০০০ মেগাওয়াট, বায়োমাস বা জৈবগ্যাস—১৭,০০০-৬০,০০০ মেগাওয়াট, সমুদ্রের তাপবিদ্যুৎ—৫০,০০০-৭০,০০০ মেগাওয়াট; সমুদ্রের ঢেউ থেকে বিদ্যুৎ—২০,০০০-৩০,০০০ মেগাওয়াট, উন্নত চুল্লি—১২০ মিলিয়ন সংখ্যা; সৌরকোষ—চাহিদা অনুযায়ী তৈরি করা যায়।

পশ্চিমবঙ্গের অচিরাচরিত শক্তি ব্যবহারের চিত্রটি বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট—১.৮৫, ৪৯১টি, বায়োগ্যাস প্রকল্প—১.১৩ মেগাওয়াট; ধানের তুষভিত্তিক প্রকল্প—৪.৬৮ মেগাওয়াট, সৌরগৃহ আলোক ব্যবস্থা—৩৮৯৪৪টি; সৌরবিদ্যুৎ কেন্দ্র—৫৮৫ কিলোওয়াট; বায়ুবিদ্যুৎ উৎপাদনকেন্দ্র—১.১ মেগাওয়াট; উন্নতচুল্লি—৩,৬৯,৭৮৭টি; জলবিদ্যুৎ প্রকল্প ২৮.৫ মেগাওয়াট। এছাড়া বিভিন্ন জেলায় জলবিদ্যুৎ বায়ুবিদ্যুৎ-সহ অচিরাচরিত শক্তির উৎসগুলিকে কাজে লাগানো হচ্ছে। বিকল্প শক্তিগুলিকে পরিকল্পনা মাফিক কাজে লাগাতে হবে।

পড়ুন ও পড়ান

'পরমাণু বিদ্যুতের বিকল্প চাই'

যৌথ প্রকাশনা (৩২টি বিজ্ঞান সংস্থা)

লেখক ঃ সুরেশ কুন্ডু মূল্য ঃ ২০ টাকা

যোগাযোগ ঃ বিজ্ঞান অন্বেষক

যোগাযোগ—বিজ্ঞান দরবার, ৫৮৫, অজয় ব্যানার্জী রোড (বিনোদনগর), পোঃ কাঁচরাপাড়া ৭৪৩১৪৫, উঃ ২৪ পঃ। ফোন ঃ ০৩৩-২৫৮০-৮৮১৬, ৯৪৭৪৩৩০০৯২

সম্পাদক মন্ডলী—অভিজিৎ অধিকারী, বিবর্তন ভট্টাচার্য, বিজয় সরকার, সুরজিৎ দাস, তাপস মজুমদার, চন্দন সুরভি দাস, চন্দন রায়, কিঞ্জল বিশ্বাস।

স্বত্ত্বাধিকারী ও প্রকাশক জয়দেব দে কর্তৃক ৫৮৫ অজয় ব্যানার্জী রোড (বিনোদ নগর) পোঃ কাঁচরাপাড়া, পিন-৭৪৩১৪৫, জেলা-উত্তর ২৪ পরগণা থেকে প্রকাশিত এবং তৎকর্তৃক স্ক্রীন আর্ট, ২০ নেতাজী সুভাষ পথ, পোঃ কাঁচরাপাড়া, জেলা-উত্তর ২৪ পরগণা থেকে মুদ্রিত।

অক্ষর বিন্যাস ঃ রিম্পা কম্পিউ, কাঁচরাপাড়া হাইস্কুল মোড়, কাঁচরাপাড়া, চলভাষ ঃ ৯৮৩৬২৭১২৫৩

সম্পাদক—শিবপ্রসাদ সরদার। ফোন ঃ ৯৪৩৩৩৩৪৩৮০) E.mail-ganabijnan@yahoo.co.in